ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1360-1368
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.141

সময়-সমাজের দর্পণে নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস: বিশ শতকের আট ও নয়ের দশকের প্রেক্ষিতে

আদিত্য চক্রবর্তী, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the flow of time, the changing circumstances of the country and era inevitably transform the forms of art and literature. Therefore, it is natural that the profound resonances created in the thoughts and consciousness of people in a specific region during a particular period are reflected in literature. In this context, this study attempts to perceive the resonances of this era in Bengali novels of the last two decades of the previous century. The context of this era has been derived from the novels of 10 novelists, comprising 14 novels. These novels reflect the state of the marginalized people in society, the nature of Operation Barga and the Panchayati system, the impact of the Ram Mandir controversy and the nationwide communal riots, the beginning of globalization, and its influence on Bengali life and consciousness, among other multifaceted areas. In these 20 long years, the transformation in the life, consciousness, and values of Indians, particularly Bengalis, has been rapid. The market economy and the mesmerizing spectacle of Globalization have gradually dominated the proposals and reports of the world, making it a subject of intense study and scrutiny in every branch of Social Science. Although novels are fictional narratives, they are not entirely imaginary; their proximity to reality is a primary condition for such creative endeavors. Therefore, through this study, the vibrant history of this particular era, as reflected in Bengali novels, has been explored in terms of its relevance to time and society.

Keywords: Operation Barga, Panchayati system, Ram Mandir controversy, Globalization, Market economy

(১)

সাহিত্য সময়ের শিল্প। এই সময় আমাদের চেতনার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, নদীর জলধারার ন্যায় তা আমাদের জীবনপ্রবাহের সমান্তরালে বহমান এক নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মতো বিরাজমান সত্তা। তাই যেকোনো কালের সাহিত্যই স্পর্শ করে গেছে সময়ের তরঙ্গকে। এই 'সময়' শব্দের সঙ্গে যেহেতু ইতিহাস ও সমাজের অভিন্ন সংযোগ, তার ফলস্বরূপ সাহিত্য অভ্রান্তভাবে ধারণ করে সেই ঐতিহাসিক কালেরও চিহ্ন।তাই সাহিত্য ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি হলেও একটি বিশেষ যুগের প্রবণতা ধরা পড়ে সেই শিল্পকর্মে। বিশেষত উপন্যাস বা ছোটগল্পের মতো সাহিত্যের নবীনতর শাখা, যার জন্মই কালের দাবিতে, সময় ও সমাজের যুগ্ম করতলে[১], সেখানে কালের স্পন্দন আরোই সুস্পষ্ট। একজন ঔপন্যাসিক তাঁর মানস-অভিধানে যে শব্দ সমুচ্চয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাবলীল প্রক্রিয়ায় আত্মদর্শনে সচেষ্ট হয়; আপন সৃজন প্রতিভার জারকে তা বিমিশ্রিত করে উপন্যাস রচনা করেন।

একুশ শতকের সূচনালগ্নে নাটককার ব্রাত্য বসু 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে 'সাচ্চা কমিউনিস্ট' হওয়াকে 'পবিত্র কর্তব্য' বলে মনে করা কালপরাহত সব্যসাচী সেনকে তার পুত্র ইন্দ্র প্রশ্ন করেন—

> "গরবাচভের নাম শুনেছেন? গ্লাসনস্ত বা পেরেস্ত্রৈকা কী জানেন? চেচেস্কু? বার্লিন দেওয়াল ভেঙে গেছে জানেন? সোভিয়েত আর নেই জানেন?... গ্লোবালাইজেশন কাকে বলে শুনেছেন? রামমন্দির—ম্যাকডুয়েল মোহনবাগান—রাজীব গান্ধী—মেট্রোরেল—পোস্ট মর্ডান—তৃণমূল কংগ্রেস—তপন সিকদার—এনরন—সঞ্জীব গোয়েঙ্কা—হর্ষ নেওটিয়া—ওসামা বিন লাদেন—পোটো—পোকো এগুলো কী? বোঝেন?"[২]

আলোচ্য সংলাপে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন শব্দ, ঘটনা, চরিত্র নাম এই সবটাই একটা যাপিত জীবনের সময়কে, সময়ের টঙ্কনকে বহন করে চলেছে। যার সাথে জুড়ে রয়েছে আমাদের জীবন, মূল্যবোধের পরিবর্তমান ইতিহাসের চিহ্ন। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কাল প্রেক্ষাপট, তা মুখ্যত আমাদের বর্তমান সময়ের যাপনচিত্রের যে রূপ, তার নির্মাণ পর্বের সূচক অধ্যায়। বিশ শতক এবং একুশ শতকের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, পরিবেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি বিস্ফোরণে যে ব্যবধান দেখতে পাই, সেই বৃহৎ বিবর্তনের সূচনা-পর্ব রূপে আমরা বিশ শতকের আট ও নয়ের দশককে চিহ্নিত করতেই পারি। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে ভারতীয় তথা বাঙালির জীবন, চেতনা, মূল্যবোধের রূপান্তরে যে দুর্নিবার গতিপ্রাবল্যের সঞ্চার ঘটেছে, বাজার অর্থনীতির চক্রব্যূহ এবং বিশ্বায়নের লাস্যময় বিভ্রম যেভাবে ক্রমশ বিশ্বের যাবতীয় প্রস্তাবনা এবং প্রতিবেদনের অন্তরালে বিরাজ করছে তা সময়ের দর্পণে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখারই নিবিড় অধ্যয়ন ও অভিনিবেশের বিষয়। উপন্যাস কল্পিত আখ্যান হলেও তা কল্পনাসর্বস্ব নয়, বাস্তবের সংলগ্নতাই এ সংরূপ সৃজনের অন্যতম প্রধান শর্ত। দুই দশক সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত নির্বাচিত উপন্যাসে, যেখানে এই 'কালের পদধ্বনি' স্পষ্ট শ্রুত হয়, তাকে সময় সমাজের যোজ্যতায় পাঠ ও নিরীক্ষণের মধ্যবর্তিতায় এই বিশেষ সময়ে দেশ-জাতি-সত্তার স্বরূপ ও অভিজ্ঞান অন্বেষণ-ই এ রচনার অভিপ্রায়।

(২)

পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতির গতিপ্রবাহের নিরিখে একে বলা যেতে পারে আপাত নিস্তরঙ্গ কালপর্ব। কারণ ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার এই সময় পর্বে নিরবচ্ছিন্ন স্থায়িত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছে। ১৯৭৮ সালে গৃহীত 'অপারেশন বর্গা' এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামাঞ্চলে ভিত্তিকে আরো মজবুত করে তুললো। অন্যদিকে একইসঙ্গে দেশে অধিষ্ঠিত জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠা থেকে অবিশ্বাস, অন্তর্বিরোধ এবং আত্মক্ষয়ী সংঘাতধ্বস্ত হয়ে পতন ঘটল। ১৯৮০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব ফিরে পেলেন ইন্দিরা গান্ধী।

ক্ষমতায় এসে ইন্দিরা গান্ধী জারি করেন এসমা (জরুরি পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ আইনঃ জরুরি পরিষেবা—বিশেষত গণপরিবহন, চিকিৎসাক্ষেত্র এবং সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারকে খর্ব করে এই আইন) এবং নাসা (জাতীয় সুরক্ষা আইনঃ দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রশ্নে সন্দেহভাজনকে বিনা বিচারে আটক করার ঘোষিত অনুমতিপত্র) এর মতো আইন। ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবে 'অপারেশন ব্লু স্টার' চালানো হয়, যার লক্ষ্য ছিল খালিস্তানি উগ্রপন্থী। ওই বছর ৬ই জুন, ইন্দিরা সরকার অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযান চালায়। ১৯৮৪ এর ৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার দুই দেহরক্ষী, বিয়ন্ত সিং এবং সতবন্ত সিং এর হাতে গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় দেশজুড়ে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।দিকে দিকে নির্বিচারে শিখ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও নিধন চলতে থাকে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব তুলনায় অনেক কম। ৪ টা নভেম্বর, কলকাতার নানা এলাকায় শান্তি মিছিল নামে, এমনকি বহু স্থানে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের মিলিত মিছিল হয়। ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভূপালে মার্কিন কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক কারখানা থেকে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো বিষাক্ত মিক গ্যাস। এ ঘটনা সমগ্র ভারতকে সচকিত করে তোলে।

১৯৮৪ তে এই আবহেই অনুষ্ঠিত হলো লোকসভা নির্বাচন। 'ইন্দিরা হাওয়া' কে পুঁজি করে প্রত্যাশিত মতই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধী। বঙ্গে এই নির্বাচনেই যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বাম প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে আলোচিত নাম হিসাবে উত্থান ঘটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৮৫ সালে শাহ বানু মামলার রায় ঘোষণা হয়। ১৯৮৬ এর ১লা ফেব্রুয়ারীতে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলা আদালত বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রসীমা মধ্যে স্থাপিত হিন্দু মন্দিরের দ্বার হিন্দুদের পূজার জন্য খুলে দেওয়া হয় (যার আবেদন জমা পড়ে মাত্র ৩ দিন আগে, ২৮ শে জানুয়ারি, ১৯৮৬)। ১৯৮৪-৮৯ সালের মধ্যে রাম-জানকী রথযাত্রা, বাবরি মসজিদে তালা খোলার আন্দোলন, শিলাপূজন, শিলান্যাস— এসবের মাধ্যমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি রামন্দিরের আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলেছিল। এই আবহেই ১৯৮৭ সালে দূরদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে 'রামায়ণ' সম্প্রচার শুরু হয়। ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্তানে এক অখ্যাত গ্রামে সতীদাহ প্রথার ঘটনা সংবাদ শিরোনামে আসে।

সাম্প্রদায়িক সংকটের আবহ এবং 'বোফর্স কেলেঙ্কারি'— এই আবহেই ১৯৮৯ এ লোকসভা নির্বাচন হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ হয়ে ভারতীয় রাজনীতির তারকা হয়ে উঠে আসেন ভি.পি. সিং। তাঁর জনতা দল পায় ১৪১ টি আসন। অন্যদিকে অযোধ্যাকে সামনে রেখে ২ আসন থেকে বিজেপি হয়ে ওঠে ৮৫। ১৯৯০ এ বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানী রামমন্দির নির্মাণে সমর্থন আদায়ে দেশজুড়ে শুরু করেন 'রথযাত্রা'। ১৯৯২ এর ৬ ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় হিন্দুত্ববাদীরা। দেশজুড়ে প্রবল আকারে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ।

১৯৯১ সালের ৩১শে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের শ্রীপেরামবুদুরে এক আত্মঘাতী বোমায় নিহত হন রাজীব গান্ধী। নয়ের দশকে ভারতে একাধিক স্বল্পমেয়াদী জোট সরকার তৈরি হয়। চন্দ্রশেখর (২২৩ দিন), অটল বিহারী বাজপেয়ী (১৩ দিন), দেবগৌড়া (৩২৪ দিন), ইন্দরকুমার গুজরাল (৩৩২ দিন) এর সরকার গঠিত হয়। মাঝে নরসিমা রাও নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে ১৯৯১-৯৬। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী এর নেতৃত্বে এন.ডি.এ সরকার গঠিত হয়,যা ২০০৪ সাল অবধি ক্ষমতায় থাকে।

১৯৯১ এর ২৪শে জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলো। ওই বছরই নরসিমা রাও মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী দেশের ভগ্ন অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার নামে অর্থনৈতিক উদারীকরণের ঘোষণা করলেন। যার প্রভাবে ভারতের বাজার অবাধ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত হয়। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে অবাধ আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার কর্তৃক WTO এর সঙ্গে GATT চুক্তি সাক্ষরিত হলো। এর ফলে দেশজুড়ে যে আর্থিক পরিবর্তন সূচিত হলো, বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশ, বৈদেশিক সংস্কৃতির আত্তীকরণ, প্রযুক্তির যথেচ্ছাচার, সীমাহীন ভোগবাদ আমাদের যাপিত জীবনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে তুলল।

১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই ভারতের সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে 'মণ্ডল কমিশন' গঠন করেন। ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কমিশন তাদের প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিলেও তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে। 'মণ্ডল কমিশন' এর সুপারিশ অনুসারে ২৭% ওবিসি সংরক্ষণ হয়।

বঙ্গীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই সময়কালকে আপাত নিস্তরঙ্গ পর্ব বলেই চিহ্নিত করা যায়। বামফ্রন্টের অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথমেই ছিল ভূমি-সংস্কার— বর্গাদারদের অধিকারকে আইনসম্মত রূপ দেওয়া। এই সংস্কারের ফলে উপকৃত হয় দশ লক্ষেরও বেশি কৃষক। স্থান ভেদে কোথাও হয়তো এই উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের রচনাতেও উঠে এসেছে, তবুও নিঃসংশয়ে স্বীকার্য যে গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবন যাপনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারমধ্যেও যে সকল ঘটনা বাংলার সমাজ রাজনীতির ইতিহাসের স্মরণযোগ্য— ১৯৮২ সালের ৩০ শে এপ্রিল 'বিজন সেতু' তে ৪০ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ সালে গৌড়িবাড়ি হাঙ্গামা, কসবা এবং ম্যাডস্কস্কোয়ারে খুনের ঘটনা ঘটে। ১৯৮৪ এর ২৫শে এপ্রিল থেকে 'আনন্দবাজার গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস' এ লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯৮৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর আয়োজিত হয় বিতর্কিত 'হোপ ৮৬'। ১৯৮৭ এর ১৬ই জানুয়ারী দয়ানন্দ আর্য নামে এক ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীকে 'পদ্মশ্রী'র জন্য সুপারিশ করা নিয়ে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নাম বিতর্কে আসে। ১৯৮৬ সালের ২২শে মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসকদলের কর্মীসংগঠনের হাতে লাঞ্ছিত হন। ১৯৮৮ সালে আর.এস.পি নেতা তথা পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী 'বেঙ্গল ল্যাম্প' কেলেঙ্কারি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তোলেন এবং দলের নির্দেশে ২৮শে অক্টোবর পদত্যাগ করেন। ১৯৯০ তে বানতলা ধর্ষণ মামলা। ১৯৯৩ এর ২১শে জুলাই তারিখে যুব কংগ্রেসের সভায় পুলিশের গুলি চলে, নিহত হয় ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। ১৯৯৬ সালে মাত্র

১৩ দিনে বাজপেয়ী সরকারের পতন হয়। এই সময়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সামনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ চলে আসে, কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তিতে শেষ অবধি তা বাস্তবায়িত হয় না, প্রধানমন্ত্রী হন দেবেগৌড়া। এ প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর মন্তব্য 'was a historic blunder' আজও এক চর্চিত বিষয়।

১৯৮৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আস্ফালন। দার্জিলিং এ নেপালী ভাষাগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে সুভাষ ঘিসিং এর নেতৃত্বে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। কখনো কামতাপুর, কখনো গ্রেটার কোচবিহারের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিতে থাকে। ১৯৯৬ সালে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় কামতাপুর পিপলস পার্টির। আসামে বোড়ো জাতির জন্য রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। দার্জিলিং এ ১৯৮৬-৮৮ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে সহিংস রাজনৈতিক অস্থিরতায় ১২০০ মানুষ প্রাণ হারান। ১৯৮৮ সালের ২২শে আগস্ট কোলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জি এন এল এফের মধ্যে সাক্ষরিত চুক্তিবলে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠিত হয়।

আলোচ্য সময় পর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আমাদের জীবনযাপন, রুচি, সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আনে। ১৯৮৩ এর জুনে কোলকাতা দূরদর্শনে রঙিন চ্যানেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ১৯৮৩ তে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় ক্রিকেটকে বিপুল জনপ্রিয়তায় নিয়ে যায়। যার প্রভাবে ১৯৮৭ তে ভারতেই ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়,ইংল্যাণ্ডের বাইরে এই প্রথম কোনো বিশ্বকাপের আয়োজন। দেশের মানুষের আবেগের এই তাপ অনুভব করে ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে আসেন ধীরুভাই আম্বানী, বিশ্বকাপের নামের সাথে স্পন্সরশিপ সূত্রে জুড়ে যায় 'রিলায়েন্স' এর নাম। ১৯৮২ সালের ১৬ই এপ্রিল ই.এম.বাইপাসের কিছু অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪শে অক্টোবর এসপ্লানেড থেকে মেট্রো চলা শুরু হয়। কলকাতা হয় দেশের প্রথম এবং বিশ্বের ৭৫তম 'মেট্রো শহর'। ১৯৮৪ থেকে হিন্দি দূরদর্শনে সিরিয়াল বা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু হয়, বাংলায় ১৯৮৭ সালে প্রথম ধারাবাহিক 'তেরো পার্বণ' আরম্ভ হয়। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'সানন্দা' পত্রিকা। ১৯৯৫ সালের ৩১শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে চালু হয় মোবাইল কমিউনিকেশন। ১৯৯৫ সালের ১৫ ই আগস্ট 'ভিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড' ভারতে সর্বসাধারণের জন্য ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করে। ১৯৯৮ সালে উইণ্ডোজ ৯৮ অপারেটিং সিস্টেম সাধারণ্যের ব্যবহারের পক্ষে সহজ এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় দ্রুতই তা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।এইভাবেই বাঙালির জীবন নব ব্যবস্থায় নব মূল্যবোধ নিয়ে 'বিশ্বগ্রাম' এর বাসিন্দা রূপে একুশ শতকের অভিমুখে অগ্রসরমান হয়।

(৩)

আলোচ্য কালপর্বের বাংলা উপন্যাসে অন্যতম একটি প্রধান প্রবণতা রূপে উঠে আসে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রণে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেও ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে জায়মান সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ মানসিকতা। ফলত প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত ভারতীয় তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। এ সময়ে রাজনৈতিক সমীকরণের সূত্র ধরে এবং শ্রেণি সচেতনতার মধ্যবর্তিতায় ক্রমশ সোচ্চারে প্রকাশ পেতে থাকে তাদের অস্ফুট কণ্ঠস্বর। গ্রামসির 'সাব অলটার্ন' শব্দটি রণজিৎ গুহ অন্যতর তাৎপর্যে ব্যবহার করেছিলেন এই আটের দশকেই। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাও ওই সময়েই পরিচিতি পায়। কথাসাহিত্যে সমাজের এই বিশিষ্টতলের ছবি বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন।

দেবেশ রায়ের বিখ্যাত 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। বিভিন্ন উপন্যাসে('মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত') 'বৃত্তান্ত' শব্দটি লেখকের কলমে অন্তহীনতার সাংকেতিক তাৎপর্য পেয়েছে। যেমন অন্তহীন উন্নয়ন ও উচ্ছেদের ব্যবস্থাকে বাঘারুর প্রত্যাখ্যান। তিস্তাপারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, বিভিন্ন জনজাতি এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সহাবস্থানে সৃষ্ট ঘাতপ্রতিঘাত, রাজনৈতিক দলগুলির কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থতা, গয়ানাথের মতো মালিকদের নিরন্তর শোষণের ছক, কেন্দ্র ও প্রান্তের জটিল বহুমাত্রিক সংঘাত ও সমঝোতার মধ্যে এক মহাকাব্যিক নায়ক ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণ।[৩] বাঘারু তার সহজাত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে অনুভব করে তাকে তার পরিচয় ও পরিবেশ থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের চক্রী সমাজ সভ্যতা রাজনীতি রাষ্ট্র সকলেই। বাঘারু শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যানের পথে হেঁটে গেছে মাদারিকে নিয়ে। আঞ্চলিকতার উপাদান প্রবলমাত্রায় থাকলেও আঞ্চলিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে যে প্রবহমান বিপন্নতাকে স্পর্শ করেছে তার দেশকাল নেই।

মহাশ্বেতা দেবীর 'সুরজ গাগরাই' (১৯৮৩) উপন্যাসটি আশির দশকের সিংভূম অঞ্চলের সময় ও পরিসরে রচিত। ১৯৮১-৮২ সালে চেরো বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে হো-আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠে এসেছে। উপন্যাসের স্তরে স্তরে সংগ্রামের স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে হো-আদিবাসীদের সিংভূমের খনিজ সম্পদ ততদিনে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়াদের দখলে। অথচ সে জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা দরিদ্রতর। জঙ্গলের গাছ থেকেও তাদের অধিকার প্রতারণা পূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছে দালাল ও ঠিকাদারেরা। আদিবাসী জীবন সম্পৃক্ত শাল গাছ কেটে বসানো হচ্ছে লাভজনক সেগুন গাছ। এই বিপন্ন অবস্থা থেকেই উপন্যাসের নায়ক সুরজ গাগরাই এর বড় হয়ে ওঠা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া। তার এই সংগ্রাম নির্যাতিতের বৈধ অধিকারের সংগ্রাম, আপন অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। কিন্তু আধিপত্যকামী রাজনীতির দৃষ্টিতে তারাই চিহ্নিত হয় 'দেশদ্রোহী' রূপে। স্বাধীনতার তিন দশক অতিক্রমণের পরেও স্বাধীনতার যথার্থ স্বাদ আসেনি আদিবাসী জীবনে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপের রাজনীতিতে যে নিষ্পেষিত আদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষ, সে সত্যই এই উপন্যাসে প্রতিভাত হয়।

প্রফুল্ল রায় রচিত 'রামচরিত্র' (১৯৮৪) উপন্যাসে বিহার রাজ্যের সেই সমাজবাস্তবতা, যেখানে জমিদারী প্রথা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ সমসময়েও জায়মান। লখিনপুরা টাউনের জমিমালিক 'শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান, চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ' রামচরিত দেও নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন কারণ—

> "লখিনপুরা সীটে দু'জন অচ্ছুৎ, একজন মুসলমান ও একজন খ্রীস্টান এবার চুনাওতে দাঁড়িয়েছে... আমাদের জনপ্রতিনিধি একজন মাইনোরিটি কি অচ্ছুৎ হতে পারে!"[৪]

তার পূর্বপুরুষ রামসিংহাসন দেও এর অমর কীর্তি একপ্রান্তে পবিত্র রামসীতা মন্দির এবং অন্যপ্রান্তে রেণ্ডিটুলি। এখন তাই রামচরিত এসেছে যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে 'হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা' রক্ষা করতে। নির্বাচনী ময়দানে রামচরিতকে কঠিন লড়াই এর মোকাবিলা করতে হয় এবং রাজনীতির সুচতুর চালে শেষ অবধি সামান্য ব্যবধানে সে জয়লাভও করে। যদিও এই আজন্মশোষিত নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতিরোধের শক্তি যে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে এই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজপ্রতিভূদের, তা তাদের আশঙ্কার উচ্চারণেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

> "মাইনোরিটি আর অচ্ছুৎরা চুনাওতে জিতে এসেম্বলি আর পার্লামেন্টে গেলে গভর্নমেন্ট, দেশ— সব কিছু ওদের হাতে চলে যাবে। ওরা এমন কিছু কানুন বানাতে পারে যাতে হিন্দু ধরম আপার কাস্ট হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।"[৫]

(৪)

১৯৭৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের স্বৈরাচারী ও অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুনভাবে পথচলা শুরু হয় বামফ্রন্ট সরকারের। নতুন সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও ভূমি-সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল। রাজ্যের গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধে উন্নয়নের লক্ষে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের লেখা 'যাদের রাজা হবার পালা' প্রবন্ধের ভাষ্যেও উঠে আসে সেই স্বপ্নময় জাদু—

> "যে গ্রামে সুযোগ সুবিধাগুলি জোতদার-রাজপুরুষ-মহাজনরা নিজেদের মধ্যে এতদিন বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছিলেন সেই গ্রামেও এখন জাদুর ছোঁয়া লেগেছে। ...নিজেদের অগ্রাধিকার তাঁরা নিজেরা বিচার করবেন, যাচাই করবেন, স্থির করবেন কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে।"[৬]

কিন্তু সময়ের পচন অচিরেই প্রদর্শিত হতে শুরু করে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পক্ষ-বিপক্ষ' (১৯৮৮) উপন্যাসে দেখা যায় কতিপয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির বাতাবরণ তৈরি করেছে। গোকুল ও পশুপতির মতো পার্টির জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গে থাকলেও ধীরে ধীরে বাদল কর্মকার, ধ্রুব গুপ্ত, প্রশান্তর মতো মধ্যবিত্তরা রাজনীতিতে অনেক পরে আসা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বাদের লোভে দলের আস্থাভাজন হয়ে উঠছে। শুরু হয় বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ, স্বজনপোষণের মতো আদর্শহীন কর্মের অন্তহীন পালা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮২) উপন্যাসের বিভিন্ন বাচনে 'অপারেশন বর্গা' র যে সাফল্য প্রচারিত হয়ে এসেছে, তার কিছু সীমাবদ্ধতা, বিশেষত আদিবাসী অঞ্চলে— সে কথাই স্পষ্ট উঠে এসেছে। পার্টি কর্মী ইন্দ্র এম এল এ সামন্তকে প্রশ্ন করে—

> "রামেশ্বরের জমি তো অঢেল। সে জমি সরকারের খাস হয়েছে? বর্গা রেকর্ড হয়েছে? অপারেশন বর্গায়?"[৭]

বর্গাদার জমির মালিক হবে— এ আইন অনেকদিনের পুরোনো। তবে কোনোদিনই তা বলবৎ হয়নি। ১৯৭৬ সালে একটা তাগিদ হয়েছিল কিন্তু পরপরই দেখা গিয়েছিল নানা সমস্যা। কারণ বর্গাদারকে লড়তে হবে জমিমালিকের সঙ্গে। জমিমালিক হাইকোর্ট অবধি মামলা টানতে পারে, কিন্তু বর্গাদারের সাধারণত মুনসেফ আদালত অবধিও যাবার পয়সা থাকে না। উপন্যাসে দিলীপ সোরেনের বাচন এখানে উল্লেখযোগ্য—

> "বর্গা রেকডে মরতাসে ছুচা ইদুর জমিরমালিক। বাঘ সিংহ যেমন কে তেমন রহি গেল। খাস জমিন আছে, আমরা পাব নাই"[৮]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্ষমতার বারান্দা'(১৯৮৮) উপন্যাসে অক্ষয় দত্ত নামে 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল' এর নেতাকে দেখা যায় পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে। ক্ষমতাতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অক্ষয় ক্রমশ ক্লান্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়তে থাকে। যৌবনে হলিউডি নায়ক ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস তাঁর অপরাজেয় তলোয়ার খেলায় অক্ষয়ের প্রেরণা হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দূষণ ও কায়েমি স্বার্থের তরবারির তীক্ষ্ণ ফলায় আক্রান্ত অক্ষয় বন্ধ্যা মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করে আপন চেতনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের চিত্রণে এবং ঘটনা পরম্পরায় আর এস পি দলের সদস্য মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং ওই একই বছরে সামনে আসা 'বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি' র প্রচ্ছায়া লক্ষ করা যায়।

ভগীরথ মিশ্রের 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০) উপন্যাসে ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের বহুস্তরীয় ভূমিকার কথা বিধৃত হয়েছে। লাল শোষিতের রক্ত আর নীল শোষকের। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই হয়তো বা রয়েছে এই দুই রক্তের সহাবস্থান। স্থান কাল পাত্রের আনুকূল্যে চোরা নীল রঙের স্রোত বইতে থাকে ভিন্ন খাতে। উপন্যাসে বর্ণিত গুরুপদ মান্নাও তেমনই এক চরিত্র। রাইটার্স বিল্ডিং এ কর্মরত গ্রুপ ডি কর্মী গুরুপদ শোষিত শ্রেনির এক প্রতিবাদী মুখ। ঘুষখোড় অফিসারদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা, আবার অসহায় পেনশনারের একটি ছোট কাজ করবার জন্য ঘুষ নিয়েও কাজ না করে সুযোগ পেয়ে অফিস থেকে অগ্রিম বেরিয়ে যান গ্রামের উদ্দেশ্যে। সপ্তাহের শেষে খড়্গপুর স্টেশন থেকে ঘন্টা দেড়েক দূরে নিজের গ্রামে পৌঁছাতেই রাইটার্সে হিম হয়ে থাকা নীল রক্ত তৎক্ষণাৎ টগবগিয়ে ফুটতে থাকে, ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে আধিপত্যবাদের বেড়ালটি, যার নখ দাঁতে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে ওই গ্রামে সম্মান ও মর্যাদাগতভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের।

সত্তর দশকে অরাজক পরিবেশের সুযোগে এবং শাসক কংগ্রেসের মদতে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান হয়ে ওঠে সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য। একদিকে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হতে থাকে অন্যদিকে কলকাতা শহরে দিকে দিকে শুরু হয় কালীপূজার বিপুল বহর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুনন্দর জার্নাল'-এ ৭/১১/১৯৭০ এ লিখিত কলামে উঠে আসে সে প্রসঙ্গ—

> "চাঁদার সঙ্গে সঙ্গে যখন থেকে ছোরা বেরুতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই আমাদের উৎসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সবটাই প্রবল, বলিষ্ঠ, প্রায় প্রলয়ঙ্কর।"[৯]

ক্ষমতা বদলের পরে এই সমাজবিরোধীরাই ধীরে ধীরে নতুন শাসকের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে শুরু করে। গৌড়িবাড়ির হেমেন মণ্ডলের অত্যাচারে অতিষ্ট জনগণ দলমত নির্বিশেষে যে সফল নাগরিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবী 'বৈসূচনের সেনা' (১৯৮৭) উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসে ডাক্তারবাবু, অভিরূপ, সন্দীপদের মতো নাগরিকের মিলিত স্বর পরাহত করেছিল শিবেনের মতো সমাজবিরোধীকে। যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নাগরিক স্বর-ই পারে প্রশাসনকে রাজনীতিক ও সমাজবিরোধীদের পরিবর্তে জনতার হুকুমকে মানতে বাধ্য করাতে।

(৫)

আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই অযোধ্যার বিতর্কিত জমিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। ১৯৮৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদ আদালতের ১৯৪৯ সাল থেকে বন্ধ তালা খোলার নির্দেশই অযোধ্যা নিয়ে, বাবরি মসজিদ নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছিল। দিকে দিকে সক্রিয়

হতে থাকে মৌলবাদী সক্রিয় সংগঠনগুলি। ১৯৯২ এর ৬ ই ডিসেম্বর পুলিশের বিনা বাধায় করসেবক দল বাবরি মসজিদের গম্বুজে আঘাত করে। দাঙ্গা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নেয় বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে। শিবসেনা দলের 'বিজয় মিছিল' মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও দোকান পাট আক্রমণে। বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তুলনামূলক অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গার্ডেনরিচ সহ নানা এলাকায় সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি তৈরি করে।

অভিজিৎ সেন 'আঁধার মহিষ'(১৯৯২) উপন্যাসে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিপরীতে প্রেম প্রীতি ও হৃদয়ের সংযোগকে স্বীকৃতি দিয়ে কামাল ও অলকানন্দা নামে দুই ভিন্ন ধর্মের নারী পুরুষ সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, অসীম সাহসে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিজেদের স্থিতি বৃত্তির অনিশ্চয়তার চরম মূল্য দিয়েও দাম্পত্য জীবন শুরু করে। কিন্তু অযোধ্যার বিতর্কিত জমিকে কেন্দ্র করে যে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্ট হয়, তা এই ধর্মান্ধতা মুক্ত চৈতন্যেও নানান প্রশ্নচিহ্ন, সংশয়ের সূচনা করে। অলকানন্দা কামালের উদ্দেশ্যে বলে— 'তুমি ভারতীয় মুসলমান, কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট জিতলেই সেই মুহূর্তেই খোলস খসে পড়ে।' এর কারণ হিসাবে কামাল বলে 'আলবাৎ পড়বে। সংখ্যাগুরু কি আমাকে ভারতীয় মনে করে?' দাঙ্গার বিষবাষ্প চেতনার কোন গভীরতায় গিয়ে আঘাত সৃষ্টি করেছে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে আজীবন শ্রদ্ধার সাথে বহন করে চলা দুই বিশুদ্ধ মানবাত্মাও দাঙ্গার লেহন থেকে রক্ষা পায়নি তা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাঙ্গার আবহে মহরমের দিন পীরগঞ্জে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সে ঘটনায় মুসলমান ও হিন্দু লোকেরা অলকানন্দাকে ধর্ষণ করে, কামালকে আহত হতে হয়।সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরপেক্ষতার কোনো নিস্তার নেই, যেমন হিন্দু-মুসলমান কারুর হাত থেকেই রেহাই পায়নি কামাল-অলকানন্দা। রক্তাক্ত হয়ে ধূলিমলিন হয় তাদের বহুযত্নে লালিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশী ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিন 'লজ্জা' (১৯৯৩) উপন্যাসে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলশ্রুতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তরঙ্গ কীভাবে ভারত ভূখণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশেও প্রভাব বিস্তার করে, সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে আঘাত তৈরি করেছে, তার পরিচয় রেখেছেন—

> "বাবরি মসজিদ দেখেনি সুরঞ্জন। দেখবে কি সুরঞ্জন অযোধ্যায় যায়নি কোনোদিন, দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি তার। সে এটা মানে, ষোড়শ শতাব্দীর এই স্থাপত্য কাজে আঘাত করা মানে এ কেবল ভারতীয় মুসলমানকে আঘাত করা নয়, সমগ্র হিন্দুর উপরও আঘাত, আসলে এ পুরো ভারতের উপরেই আঘাত, সমগ্র কল্যাণবোধের উপর, সমবেত বিবেকের উপর আঘাত।"

এই গ্রন্থটি মাত্র ছয় মাসে ৫০ হাজার কপি বিক্রি হয়, বইটি ইসলামিক ভাবাবেগে আঘাত করেছে বলে অভিযোগে বইটিকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাকে দেশত্যাগ করতেও বাধ্য করা হয়।

(৬)

নয়ের দশকের সূচনা লগ্ন থেকে বাংলা তথা ভারতীয় জীবনপ্রবাহ বিশ্বায়নের বিস্মরণের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বহমান হতে শুরু করে। তৈরি হতে থাকে আপন সত্তার জায়মান অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন, দেশ-কাল-সময়-সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত, উদাসীন এক আত্মসর্বস্ব জীবনধারা। অন্তরের ক্ষয়কে পুঁজি ব্যবস্থা এক রঙিন, জাদুকরী মোড়কে ঢেকে রেখেছে। পুঁজিবাদী পণ্যায়নের সম্মোহনে রোমহর্ষক পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নিরন্তন বসবাসে একটা সময়ে মানুষ নিজেই পরিণত হয়ে যায় পণ্যে। এমনই এক নকল বাস্তব বা হাইপার রিয়েলিটির মধ্য দিয়ে আমাদের যাপিত জীবন বয়ে চলেছে, সেখানে এক ঝিমধরা নেশায় প্রতিটি মানুষ একা, বিষণ্ন অথচ এক আনন্দজনক হ্যালুসিনেশনে আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নতার সুযোগেই ক্রমশ বিশ্বের যাবতীয় সম্পদকে গ্রাস করে চলেছে পুঁজি নামক এক বৃহদাকার দানব। মানুষ তো বটেই, প্রকৃতি পরিবেশ সহ সকল সম্পদ তার উদরে 'সুখী গৃহকোণের' ব্যর্থ অন্বেষণে এক গোলকধাঁধা থেকে আর এক গোলকধাঁধায় প্রবিষ্ট হচ্ছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মাকচক হরিণ'(শারদীয়া বসুমতী, ১৯৯১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রাভা সমাজের জমির অধিকার রক্ষার আখ্যান বিধৃত হয়েছে। উঠে এসেছে জনুর বাবার একক সংগ্রামের অক্ষম প্রয়াস। উপন্যাসের প্রতীকী হরিণ যেন নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন প্রায় অবলুপ্ত রাভা জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। এরই অনুষঙ্গে স্মরণে আসে তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথা'(১৯৮০) উপন্যাস, 'যেখানে বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মত রক্ষা করে' এই গ্রামের অধিবাসীরা। অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকতার যাবতীয় আয়োজন এই গ্রাম চায় না। কিন্তু সেখানেও প্রবেশ করে বনভূমি কাঁপিয়ে তোলা সগর্জিত শোষক শক্তির প্রতিভু অতিকায় লরি। এইভাবেই দেশপ্রেক্ষিতে একদিক থেকে ক্রমাগত অতিকায় লরিগুলো

প্রবেশ করে আর অপর দিক থেকে জীবন পটভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় মাকচক হরিণেরা। প্রবেশের রণমত্ত গর্জনে ঢাকা পড়ে যায় প্রস্থানের নৈঃশব্দ্য।

নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট' (১৯৯২) উপন্যাস সমকালের সঙ্গে সত্তর দশকের অতীতকালকে স্পর্শ করেছে। উত্তর কলকাতার এক বনেদী পরিবারের ভাগ্যহত মানুষ হারবার্ট বাল্যেই বাবা মা কে হারিয়ে জেঠিমার কাছে মানুষ হয় এবং পারিবারিক স্বার্থপরতা এবং রাজনীতির শিকার হয়ে ছন্নছাড়ার জীবনে নিক্ষিপ্ত হয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র— সকলের নখরাঘাত থেকে আত্মরক্ষার পথ হিসাবে সে বেছে নেয় কল্পনায় উড়ান দেওয়ার। উপন্যাসে আমরা ক্রমান্বয়ে নানাধরণের প্রেতাত্মার মুখোমুখি হতে থাকি। বর্তমানের সামগ্রিক ভয়াবহতা এবং নৈরাশ্যপীড়িত কালের নবারুণ তার কুহক বাস্তবের জগৎ তৈরি করে প্রতিবাদ জারি রাখেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সমসময়ের অন্তঃসারহীনতাকে প্রকাশের পাশাপাশি নিপুণ বুননে নকশালবাদী আন্দোলনকেই যেন একমাত্র সঠিক ও অভ্রান্ত কাল বলে এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। তাদের রোমান্টিক বিপ্লববাদ, আত্মত্যাগের মহত্ত্ব এবং আদর্শের বুলিকে এ উপন্যাসে যেন সোনালী সুতোয় বুনন করা হয়েছে। অধ্যাপক অরূপকুমার দাস তাঁর 'ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়টি অবলোকনপূর্বক যথার্থই চিহ্নিত করেছেন—

> "হতমান নকশালপন্থীদের অসমীক্ষ্যকারী কৃতাচরণকে আড়াল করে এদের কার্যকলাপ ও সঞ্চালনকে দ্যুতিময় আবহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে উপন্যাসের প্রেক্ষিত দুই কালের দুই দশকের (১৯৭১ একদিকে, অন্যদিকে ১৯৯২) অন্তঃপাতী বিস্মৃতি ও ব্যবধানের সুযোগ নিয়ে।"[১০]

অমর মিত্রের 'কৃষ্ণগহ্বর' (১৯৯৮) উপন্যাসে কর্পোরেট পুঁজির লেলিহান আগ্রাসনে হুগলী জেলার গঙ্গা তীরবর্তী কাঁঠালবেড় গ্রামের কৃষিজীবী, ধীবর মানুষ সহ সমগ্র প্রকৃতি পরিবেশের বিপন্নতার রূপচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে পুঁজির সর্বাগ্রাসী পৈশাচিক চরিত্র এবং রাজনীতির কারবারিদের স্বার্থপরতা, ভণ্ডামির মুখোশ উৎপাটন করা হয়েছে। মানুষকে সভ্যতার নিয়ন আলোয় সুসজ্জিত করবার নিমিত্তে বিদ্যুৎ কোম্পানি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ৮০০ একর জমি নিয়ে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে কাঁঠালবেড়ের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের স্থিতি, বৃত্তিকে কেড়ে নিয়ে।এ জমি কোম্পানির কাছে লোভনীয় আরো, কারণ নদী তীরবর্তী এই এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়লে বর্জ্য পদার্থ গাঙের ধার দিয়ে নদীতে যাবে। বংশী মিদ্যে নামে ভাগচাষী, যে সারাদিন জমির চাষ নিয়েই পড়ে থাকতো, হাল টানতো মনের আনন্দে অথবা মধু ধীবর যে নিজেকে গাঙের সন্তান বলে দাবি করতো, বিদ্যুৎ কোম্পানির আগ্রাসনে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জীবন মুহূর্তে হারিয়ে বসতে থাকে। 'কাঁঠালবেড়ে রক্ষা কমিটি' বলে যে সংগঠন তৈরি হয় তার নেতৃত্বে থাকা রাখাল জং কে দেখা যায় কিছুদিন পরেই কোম্পানির দালালে পরিণত হতে। একদিকে সে পরিবেশকর্মী মেধা পাটেকরকে নিয়ে আনার নাম করে গ্রামের মানুষের থেকে চাঁদা তোলে, অন্যদিকে বিপন্ন মানুষকে সর্বস্বান্ত করে কোম্পানির থেকেও ভিতর ভিতর মুনাফা লাভ করে। কোম্পানির কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায়। কাঁঠালবেড়ের আকাশ বাতাস পুকুর ঘর বাড়ি সব ঢেকে যায় ফ্লাই অ্যাশে। এমনই কৌশলী শ্বাসরোধী উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সেখানে আরম্ভ হয়, যেখানে মানুষ তো বটেই গাছের পাখি, ফড়িং, কীট পতঙ্গ পুকুরের মাছ সবাইকে একসঙ্গে নির্বাসিত হতে হয় কৃষ্ণগহ্বরের গভীর অন্ধকারে। আলো, বিদ্যুৎ, কারখানা এগুলোই আজকের সময়ে উন্নয়নের সূচক রূপে চিহ্নিত হয়।আর সেই উন্নয়নের ঢাউস বিজ্ঞাপনে হারিয়ে যায় প্রান্তিক মানুষের জীবন আঁধারের অব্যক্ত যন্ত্রণা।

(৭)

বিশ শতকের দুই দশকের সময় সমাজের নিরিখে লিখিত বাংলা উপন্যাসে যে জীবনের স্পন্দন আমাদের সামনে উঠে আসে, তা বিচারধারাহীন অন্তঃসারশূন্য ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক প্রবাহ, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতাকেই তুলে ধরে। হয়তো অপারেশন বর্গা বা ত্রি স্তরীয় পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তিতায় গ্রামীণ জীবনে সদর্থক পরিবর্তন আনতে পারতো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আংশিক সাফল্যও রয়েছে, কিন্তু দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নানা উপায়ে স্বার্থ চরিতার্থতার যে অভ্যাস বাঙালি চেতনাকে গ্রাস করেছে তা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে থেকেছে।

আলোচ্য নির্বাচিত একাধিক উপন্যাসে বাংলা তথা দেশের প্রান্তিক জীবনকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণের প্রয়াস করা হয়েছে। সেই অভিনিবেশ থেকে যে সত্য উঠে আসে তাতে বলা যায় যে বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যেমন আর্য ব্রাহ্মণেরা, ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে

বঞ্চিত করেছে, তেমনই এই বিশ্বায়ন ও পুঁজি সর্বস্ব ব্যবস্থায় সবচেয়ে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে এই শ্রেণিভুক্ত মানুষকেই। কখনো তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে আপন স্থিতি, বৃত্তি খোয়াতে হচ্ছে বংশী মিদ্যে বা মধু ধীবরকে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপন অধিকার চাইতে গিয়ে সুরজ গাগরাই হয়েছে 'দেশদ্রোহী', আবার অবলুপ্ত প্রায় রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষ অধিকারের লড়াইতে গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের কূট কৌশলকে ঠিক মতো ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত রাখতে পারে রামচরিত দেও দের মতো সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিরাই।
কখনো কখনো এমন একটা যুগ আসে যখন সত্যকে মৃতপ্রায় করে রেখে অর্ধসত্যের সম্মোহিনী বিভ্রম আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষত চালিত করে। যার প্রভাবে আসল বাস্তবতার পরিবর্তে জীবন চালিত হয় নকল বাস্তবের মেকি শুশ্রূষায়। এই বিভ্রমকে কাজে লাগিয়েই ধর্মীয় মৌলবাদীরা, রাজনীতির কারবারিরা, বিচ্ছিন্নবাদী শক্তির নেতারা মানুষকে ব্যবহার করে। এই কালপর্বের সময় সচেতন লেখকগণ তার বাস্তব রূপকে যথার্থই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. দাস, অরূপকুমার। ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, ২০১২, কলকাতা, পৃ: ৫।
২. বসু, ব্রাত্য। 'নাটক সমগ্র' (১ম খণ্ড) । আনন্দ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ: ২৫৬।
৩. দত্ত ভৌমিক, গোপা। পরিচয়। প্রবন্ধ— 'সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য', ৯-১২ সংখ্যা ৯২ বর্ষ, মার্চ-জুন ২০২৩, পৃ: ৩০।
৪. রায়, প্রফুল্ল। 'রামচরিত্র'। করুণা প্রকাশনী, ১৯৯২, কলকাতা, পৃ: ৪৮।
৫. রায়, প্রফুল্ল। তদেব, পৃ: ৪৮।
৬. মিত্র, অশোক। 'সংকটের স্বরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, কলকাতা, পৃ: ৬৭।
৭. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র (১০ ম খণ্ড) । দে'জ পাবলিসিং, ২০০১, কলকাতা, পৃ: ২৬৫।
৮. দেবী, মহাশ্বেতা। তদেব, পৃ: ২৯১।
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। 'সুনন্দর জার্নাল'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৬, কলকাতা, পৃ: ৪৮৩।
১০. দাস, অরূপকুমার। তদেব, পৃ: ৯৭।